



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 524 - 531

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

নবেন্দু ঘোষের উপন্যাস ‘ফিয়ার্স লেন’ : প্রসঙ্গ দাঙ্গা

গৌরহরি বেরা

গবেষক, বাংলা বিভাগ

মেদিনীপুর কলেজ (স্বশাসিত)

Email ID: gourhari563@gmail.com

 0009-0000-7199-7467

Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Riot, Violence,
Excited,
Murder,
Hindu-
Muslim,
Humanity,
Clash, Rogue.

Abstract

Riots are a terrible event in social life. The riots broke out between the two communities, Hindus and Muslims. The riots of 1946 soon turned into Calcutta communal violence. As a result of this incident, hellish killings, looting, fires etc. Continued between Hindus and Muslims in India at that time and in the city of Calcutta. Somewhere the fire of riots is burning. The image is as red as blood and horrible. As a result of the riots, on the one hand, Hindus chanted ‘Jaihind’ and ‘Vandemataram’, while on the other hand, Muslims chanted ‘Ladke Lenge Pakistan’. The image of such a riot is captured in Nabendu Ghosh’s novel ‘Fierce Lane’. Our topic is Nabendu Ghosh’s novel ‘Fierce Lane’: Context Riots. In the novel, we can see the attack of Muslims on Hindus and on the other hand, the pictures of Hindu oppression on Muslims. Hindus and Muslims have been in conflict with each other.

Fierce Lane is the name of a street. This fierce lane stretches like an ugly python from Boubazar to Kalutola. As the picture of the life of a man named Ajmal has been caught in the novel, his humanity is worth noting. There are some Hindus living in a house next to Ajmal, and Ajmal developed a brotherly relationship among those Hindus. One such person with whom a brotherly relationship develops is called Paresh. When Paresh is in danger due to riots, Ajmal saves him from danger. The novel portrays how Ajmal, a Muslim, finally gives his life to shelter the Hindu family in his home and keep them alive. As a result of the riots, the condition of Hindus is deplorable as well as the condition of Muslims. In the novel, there is a man named Taj Mohammed who is known as gangster in the society. This person is killing, looting and torturing all Hindus. Taj Muhammad and his followers became so violent that all the Hindus were slaughtered with daggers. One such person named Panchanan was brutally stabbed to death by Taj Muhammad and his followers. At the end we will see Taj Mohammed as a Muslim stabbing a Muslim named Ajmal. Nabendu Ghosh wants to show in this novel that we have to win humanity, not riots and divisions.

Discussion

দাঙ্গা সমাজের বৃদ্ধি এক বিভীষিকাময় অভিশাপ। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গা বাংলা তথা ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। দেশভাগের প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে দাঙ্গা একটি বীভৎস ঘটনা। এই প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক বদরুদ্দিন উমরের বলেছেন -

“হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই পার্থক্যের একটা অস্বাস্থ্যকর চেতনা বর্তমান ছিল। তাই এই ভেদভঙ্গনকে তিনি পুরোপুরি ইংরেজদের সৃষ্ট বলতে চান না। তবে ইংরেজরা নিজেদের স্বার্থে সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে উভয়ের মনুষ্যত্বকে বহুলাংশে খর্ব করেছে একথা অনস্বীকার্য। হিন্দু-মুসলমানের ধর্মীয় এবং সামাজিক ব্যবধানকে নিজের সাম্রাজ্যবাদী প্রয়োজনে সক্রিয় প্রচেষ্টায় তারা পরিণত করেছে রাজনৈতিক বিরোধে। এ পরিণতির নামই সাম্প্রদায়িকতা।”^১

১৯৪৬ সালে ১৪ আগস্ট মুসলীম লিগের ডাকা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস পালনকে উপলক্ষ করে কলকাতায় ভয়াবহ দাঙ্গা তথা ‘গ্রেট ক্যালকাটা কিলিং’ এর সূচনা হয়। এই দাঙ্গা কলকাতাসহ তার পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে দাবানলের মতো। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সংঘটিত নারকীয় হত্যা, খুন, লুণ্ঠন, অগ্নিকাণ্ড প্রভৃতি ঘটনায় বাংলা তথা ভারতের বৃদ্ধি নেমে আসে এক অন্ধকার যুগ। এই দাঙ্গার সময়ে একদিকে হিন্দুদের মুখে শোনা যায় ‘জয়হিন্দ’ ও ‘বন্দেমাতরম’ অন্যদিকে মুসলিমদের শ্লোগান শোনা যায় ‘লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান’। দাঙ্গার আগুন দু’পক্ষের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে। হিন্দু মহল্লা দিয়ে মুসলিমদের মিছিল যাওয়ার সময় হিন্দুরা মুসলিমদের উপর ইট, পাটকেল ছুড়তে থাকে তেমনি মুসলিমরাও হিন্দুদের দোকানপাট লুট করতে থাকে। এর ফলে—

“হিন্দু-অধ্যুষিত অঞ্চলে মুসলমানদের এবং মুসলমান-অধ্যুষিত অঞ্চলে হিন্দুদের ঘরের বার হওয়ার উপায় ছিল না। যারাই অজানিতভাবে বেরিয়েছে, সে হতভাগ্যদের আর ঘরে ফিরতে দেখা যায় নাই।”^২

হিন্দু মহল্লায় যেমন মুসলিমদের আক্রমণ করা হয় তেমনি মুসলমানরাও হিন্দুদের উপর আক্রমণ করে দাঙ্গার দিনগুলি থেকে।

কথাসাহিত্যিক নবেন্দু ঘোষের বিখ্যাত ‘ফিয়ার্স লেন’ উপন্যাস ১৯৪৬ সালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিক্রিয়ায় রচিত। উপন্যাসটি সর্বপ্রথম ১৩৫৩ সালের শারদীয়া ‘আজকালে’ প্রকাশিত হয়। এই উপন্যাসের ভূমিকা লেখক নবেন্দু ঘোষ জানিয়েছেন -

“গত ১৯৪৬ সালের প্রথমভাগ থেকে আমি আমার এক দাদা’র ওখানে থাকতাম। তাঁর বাসা ছিল ফিয়ার্স লেন ও সাগর দত্ত লেনের সংযোগস্থলের কাছাকাছি। ১৬ই আগস্টের দাঙ্গায় আমি ঐ বাড়িতেই আটকা পড়েছিলাম। বাঁশ প্রভৃতির সাহায্যে ঐ বাড়ির ছাদ ও অন্য বাড়ির ছাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করি এবং এমনিভাবে পর পর দুটি বাড়ি অতিক্রম করে, নানা বিপজ্জনক অবস্থার ভেতর দিয়ে, পরদিন দুপুরবেলা আমরা মেডিক্যাল কলেজের খোলা মাঠে আশ্রয় নিই ও সেখান থেকে দু’দিন বাদে নিরাপদ স্থানে যাই। অনেক দিন ফিয়ার্স লেন এলাকায় থেকে ও দাঙ্গার সময়কার ঘটনাবলী লক্ষ্য করার ফলেই এই গ্রন্থ রচনা সম্ভব হয়েছে। এর ভাল মন্দ অধিকাংশ চরিত্রই আমার দেখা; তাঁরা নিছক কল্পনাপ্রসূত নন।”^৩

‘ফিয়ার্স লেন’ একটি গলির নাম। বৌবাজার থেকে কলুটোলা পর্যন্ত কুৎসিত অজগরের মতো এঁকেবেঁকে গেছে ফিয়ার্স লেন। এই গলির প্রথমে চীনারা থাকে। তারপরেই মুসলমানদের পাড়া এবং হিন্দুদের কিছু বাড়ি। হিন্দুদের অধিকাংশ বাড়ি সুবর্ণ বণিকদের। এখানে সমস্ত ধনী, গরিব মানুষ বসবাস করে। এই ফিয়ার্স লেনে রাতে গ্যাসের আলো জ্বলে ওঠে এবং তার ওপরকার ধোঁয়া অন্ধকারে কালো আকাশের কুয়াশাচ্ছন্ন আলোর মত তারা গুলো কাঁপতে থাকে। চীনা পাড়ায় গুলির আওয়াজ শোনা যায়, বন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়ায় তাজা বারুদের গন্ধ, কোন শত্রু তাঁর অন্য কোন শত্রুকে গুলি মেরে পালিয়ে গেছে। রাস্তার ওপর পড়ে আছে শোণিতসিক্ত মৃতদেহটা আবার কোথাও কোন ব্যক্তি প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য অন্য ব্যক্তিকে ছোঁরা দিয়ে খুন করে পালিয়ে যায়।

“খুন! খুন!

কেনা খুন গিরা হয়- বাপ, রে-

শালা মরকে মুর্দা বন্ গিয়া হয়-

খুনী কাঁহা গিয়া হয় জী?”^৪

এই খুন ফিয়ার্স লেন মানুষের জীবনে কোনো দাগ পড়ে না। কারণ খুন, জখম, মারামারি, কাটাকাটি, আতর্নাদ ও কোলাহল এইসব নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এই ফিয়ার্স লেন সুস্থতার পরিচয় দেয় অশ্লীল গালিগালাজ, চিৎকার, অটুহাসির মধ্য দিয়ে।

পঁচিশ বছর ধরে আজমল এই ফিয়ার্স লেন গলিতে থাকে। আজমলের একটি দোকান রয়েছে সেন্ট্রাল এভিনিউতে। এই দোকানের উপরে থাকে আজমল। আজমলের বাড়িতে একান্নবর্তী পরিবারে আজমলের বউ, দুই মেয়ে, ছেলে, ছেলের বউ সবাই একসাথে থাকে। আরব্যোপন্যাসে রাজ্যহীন রাজপুত্রের মতো তাঁর সুদর্শন ছেলে রয়েছে। আজমল পাঁচ বছর আগে হজ করেছে। সবাই তাকে ভালোবাসে। সে এটাই মানে যে আল্লার দুনিয়ায় মুসলমানদের মত আর সকলেই আল্লার সন্তান। আজমলের ছেলে হোসেন কিছুদিন ধরে গম্ভীর হয়ে উঠেছে কারণ মুসলিম লীগ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম ঘোষণা করেছে। যারা পাকিস্তানের দাবিকে স্বীকার করেছে না তাদের মধ্যে এই লড়াই। হাসিমুখেই হোসেন তাঁর বাবা আজমলকে বলল -

“এই তো মওকা আব্বাজান; কোপ বুঝে কোপ দেওয়াই তো রাজনীতি।”^৫

হোসেনের কথাবার্তায় বোঝা যায় যারা পাকিস্তানের দাবিকে মানবে না তাদেরকে মেরে ফেলবে। শুরু হবে দাঙ্গা। রাত দশটার সময় গলি দিয়ে ট্রাক যাচ্ছে। সেই ট্রাকের সামনে একটা মুসলিম লীগের পতাকা উড়ছে। ট্রাকের মাঝে বসে ও দাঁড়িয়ে আছে দশ-বারো জন লোক। একজন একটা চোঙ নিয়ে বলছে ‘মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ!’ পথচারীরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখলো। বাড়ির ঘরের ও দোকানে যাঁরা ছিল তাঁরা সবাই উৎসুক হয়ে দেখলো। চোঙধারী লোকটি আবার বলতে শুরু করল -

“মুসলেমিন ভাইয়ো-আমাদের লড়াইয়ের দিন এসেছে। বহুৎ আরজি, বহুৎ মিল্লৎ ক’রেও আমরা কাজ হাসিল করতে পারি নি। ব্রিটিশেরা আর বানিয়া কংগ্রেস আমাদের পাকিস্তান দাবীকে উপহাস করেছে। কিন্তু আর সেইব না আমরা। একদিন আমরা বাদশাহ হয়ে এসেছিলাম এ দেশে, তাই আজ আর আমরা ভিখমাংগা হয়ে থাকব না কারো কাছে। মুসলেমিন ভাইয়োঁ, আজ কোরবানী দেবার বখত এসেছে-আজ হমারি কসম্ ইয়েহ হ্যায় কি হম্ পাকিস্তান লেঙ্গে আওর লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান”^৬

হিন্দু বাড়িগুলোর জানালার গোড়ায় যাদের দেখা গেল তাদের মুখমন্ডলে ভয়ের ছাপ। তারা বলাবলি করতে লাগলো আবার কি দাঙ্গা বাধবে?

আজমলের পাশে এক বাড়িতে কয়েকজন হিন্দু থাকে, তাদের মধ্যে পরেশ বাবু একজন। পরেশ বাবুর সঙ্গে আজমল-এর এক ভাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পরেশ বাবু আজমলের সমবয়সী। বাড়ির নীচে তার সোনারুপার দোকান আছে। সেও এইগুলি বহু বছর ধরে থাকে। আজমলের সঙ্গে তাঁর বহু দিনের পরিচয়। কিন্তু আজমল-এর মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ যেমন রয়েছে তেমনি তাঁর মধ্যেও সহানুভূতিবোধ রয়েছে। বিপদের সে সবাইকে সাহায্য করে। সে বলে -

“দোস্তু, সাচ্চা মুসলমান কখনো বেকসুর লোকের অপকার করে না, তা ছাড়া, তুমি আমার দোস্তু, আমার পড়োশী, আমার ভাই। পরেশ, তুমি নিশ্চিত থাক।”^৭

১৬ই আগস্ট, শুক্রবার, বেলা নয়টায় দাঙ্গার ভয়াবহ চিত্র চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। প্রায় প্রতিটি বাড়িও দোকানে লীগের পতাকা উড়ছে। প্রায় সব দোকান বন্ধ। খুব জোরে জোরে ধ্বনিত হচ্ছে ‘মুসলিম লীগ জিন্দাবাদ’ ও ‘হিন্দু কংগ্রেস মুর্দাবাদ’। আজমল তাঁর ছেলের জন্য খুব চিন্তার কারণ তাঁর ছেলে হোসেন লীগের একজন উৎসাহী ব্যক্তি। আজমলের এসব ভালো লাগে না কারণ মুসলমানদের স্বার্থে নেতারা মুসলমানদের স্বার্থহানিই করেছে। আজমল ভাবে যাদের সঙ্গে চিরকাল থাকতে হবে তাদের সঙ্গে লড়াই করে কোন লাভ হবে না। হিংসা মানুষকে হিংসার পথে টেনে নিয়ে যাবে, এতে দিন দিন শুধু প্রতিহিংসা বাড়বে। দাঙ্গার ফলে আকবর ও তার বন্ধু তাজমহম্মদ হিংস্র হয়ে ওঠে। তাদের নীলাভ চোখের তারা দুটো

খোরাসানী তলোয়ারের মতো ঝকঝক করে। তারা একটাই বোঝে খুনকা বদলা খুন। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে আজমল তার পাশের বাড়ির বন্ধু পরেশকে আশ্রয় দিল। পরেশ বাবু তাঁর সপরিবার নিয়ে আজমলের বাড়িতে থাকলে, আজমল পরেশ বাবুকে আশ্বাস দেয় -

“চুপচাপ বসে থাকো না ভাই, ওরা আর কি করবে? মহল্লার লোক তুমি, তোমার ঘরে ঢুকে তো আর লুটপাট করবে না-আর যদি সে রকম কিছু করতে যায়, আমি কি চুপ ক’রে থাকব? অসহায় তৃণখণ্ড যেমন কুল পাবার আশায় একটু আশ্বস্ত হয় তেমনি একটু আশ্বাসের ভাব পরেশের মুখের উপর দেখা গেল। অবোধ পশুর কৃতজ্ঞতার মত একটা দুর্বল ও বিনীত ভাব তার পঞ্চাশ বছরের মুখে চোখে আত্মপ্রকাশ করল। ওদিকে দূর থেকে একটা সুতীর, সুতীক্ষ্ণ আত্নাদ বিসর্পিল গলিপথ বেয়ে এদিকে এল। কাকে যেন পিটে পিটে মারা হচ্ছে। আর শোনা গেল কোলাহল। লুটো, মারো, পাকিস্তান জিন্দাবাদ।”^৮

দাঙ্গার ফলে দোকানপাঠ লুট চলছে, সবাই চিৎকার করে বলছে পাকিস্তান জিন্দাবাদ। কতগুলো লোক ছুটে গিয়ে সাগর দত্ত লেনের হিন্দুদের মুদি ও মিষ্টির দোকান লুটপাট করছে। হিন্দুরাও কোথাও মুসলমানদের উপর অত্যাচার করছে। তাদের কয়েকজনকে ধরে ধরে মারছে। এরফলে দু’পক্ষের মধ্যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। আজমল আবারও শুনতে পেল আওয়াজ ও আত্নাদের ধ্বনি। দরজা ভাঙার শব্দ আসছে, আসছে ক্রোধোন্মত্ত মানুষের বিকট চিৎকার। দিবালোকে নরকের রাত নেমে এসেছে, নেমে এসেছে অতৃপ্ত প্রেতের দল। আজমল দেখলো দুজন হিন্দু, একজন উড়িয়া কোন এক ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ কোথা থেকে একজন চিৎকার করল সবাইকে মেরে ফেলো। দূর থেকে ভেসে আসছে লুণ্ঠন ও হত্যা এবং জনতার কোলাহলের শব্দ। তাজ মহাম্মদ ও তার অনুগামী সবাই হিন্দুদের বাড়ি ঘিরে ফেললো, যাকে পারছে ধরে ধরে মারছে। এর মধ্যে এক করুণ ছবি আমাদের চোখে পড়ে। পঞ্চগনন নামে এক ব্যক্তি একটি গরুকে নিয়ে বাড়ির একটি বাথরুমে আশ্রয় নিয়েছিল। গরুটির নাম মুংলী। মুংলীকে নিয়ে বাথরুমের ভেতরে অল্প জায়গায় দরজা বন্ধ করে থাকলো পঞ্চগনন। তাঁর বাড়িতে সবাই ঢুকে পড়েছে। সবাই চিৎকার করছে। সেই মুহূর্তে মুংলীর নাসারন্ধ্র স্ফীত হয়ে উঠেছে, একটু একটু ফেনা গড়াচ্ছে, দেহের চামড়া নড়ে উঠেছে। হঠাৎ মুংলী উত্তেজিত হয়ে ডাক ছাড়ল ‘হাম্মা হাম্মা’। এরপর মুহূর্তের মধ্যে বাথরুমের দরজায় ধাক্কা পড়ল। সবাই বলাবলি করছে লুকিয়ে আছে একজন মানুষ। যে লুকিয়ে ছিল সে হচ্ছে পঞ্চগনন। পঞ্চগনন সোজা হয়ে দাঁড়ালো। সামনেই তাজমহম্মদ, মুস্তাক ও আকবর দাঁড়িয়ে আছে। পঞ্চগনন ভয়ে কাঁঠ হয়ে গেল। সে বলল -

“আমায় মারবে? পঞ্চগনন কণ্ঠ হঠাৎ যেন ভারী হয়ে উঠল, মারো তবে, কিন্তু দোহাই আমার মুংলীকে মেরো না-দোহাই, ওর দুধ খেয়ে দেখো - ভারি মিষ্টি তা।”^৯

এরপর তাজমহম্মদ তলোয়ার দিয়ে পঞ্চগননের পাঁজরায় বিঁধে দিচ্ছে, সেই সময় আকবর নির্দেশ দিল পঞ্চগননকে ছেড়ে দিতে কারণ পঞ্চগনন খুব নিরীহ মানুষ। তাজমহম্মদ কোন কথা না শুনে পঞ্চগননকে মেরে ফেলল।

ফিয়ার্স লেনের কালো পথ দিয়ে রক্ত বয়ে যাচ্ছে। পরেশবাবু আজমলের বাড়ি থেকে শুনতে পাচ্ছে সিন্ধুক ভাঙার শব্দ। তাদের ওপর তলার ঘরের জিনিসপত্র লুটপাট করার শব্দ। চেয়ার টেবিল আলমারি চুরমার করার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে। তিল তিল করে দেহ ও রক্তকে জল করে যে সংসারকে তারা গড়ে তুলেছিল সেই সংসার এক নিমেষে শেষ হয়ে গেল। হঠাৎ পরেশবাবু চমকে উঠল কারণ তাজমহম্মদ, আজমল অর্থাৎ হাজীসাহেবকে ডাকছে। তাজমহম্মদ, হাজী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করল -

“ইস মকানকা হিন্দুলোগ কাহা গিয়া হ্যায়?

একটুও দ্বিধা না ক’রে আজমল জবাব দিল, আমি জানি না।

তাজ মহম্মদ যেন কথাটাকে বিশ্বাস করল না, কটমট ক’রে সন্দিগ্ন দৃষ্টি মেলে সে খানিকক্ষণ আজমলের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর অর্ধ-স্বগতোক্তি করল, লেकिन যায়েগা কাঁহা? আচ্ছা, বাহার করেঙ্গে, টুঁর লেঙ্গে।”^{১০}

তাজ মহম্মদের মতো কিছু যে গুন্ডা-দুর্ভুক্তরা এই দাঙ্গা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু এ ব্যাপারটা শুধু যে গুন্ডাদের হাতে ছিল তা নয় 'ভদ্র' মধ্যবিত্ত পরিবারের যুবকরাও দাঙ্গায় জড়িয়ে পড়ে যেমন আজমলের পুত্র হোসেন। আজমল তার পুত্র হোসেনকে এই দাঙ্গা, এই অন্যায্য করতে বাধা দেয়। আজমলের মধ্যে একটা মনুষ্যত্ববোধ ছিল। এই দাঙ্গা ফিয়ার্স লেনকে ক্ষত-বিক্ষত করে দেয়, এই দাঙ্গার ফলে সাধারণ মানুষের মনে ঘৃণা ছড়িয়ে পড়ে। এক সম্প্রদায়ের মানুষ অন্য সম্প্রদায়ের এলাকায় প্রবেশ করতে সাহস পায় না। নালা-নর্দমায় থেকে গলিত মৃতদেহ বের হয়। এই অস্থির পরিস্থিতিতে কিছু কিছু মানুষ বলে হিন্দু-মুসলমান এক হও। আবার একটি ট্রাক থেকে গোটা দশেক মানুষ নেমে কোলাহল সৃষ্টি করল এবং অস্থির পরিবেশ সৃষ্টি করল। একজন মুসলমান ট্রাকের ওপর থেকে বলল -

“ভাই সব, ঠাণ্ডা হও -হিংসার আগুনে নিজেকে পুড়িয়ে মেরো না। ভাই সব, কার বিরুদ্ধে লড়াই করছ তোমরা, ভাইয়ের বিরুদ্ধে ভাই লড়ছ? এ যে আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছু নয়। এতে আমাদের কোনও লাভ নেই, এতে আমাদের পরাধীনতার মিয়াদ আরও বেড়ে যাবে, এতে শুধু ইংরেজ বণিকই লাভবান হবে।”^{১১}

এইসব বলার পরও তাদের মনে থেকে হিংসা কমে না। তারা বলতে লাগলো হিন্দু লোকও মুসলমানদের অনেক মানুষকে মেরেছে। এইসব হিংসা আর রক্তের আগুনে ফিয়ার্স লেন কলুষিত হয়ে উঠল। আজমল ভাবতে লাগলো মুসলমান পাড়ায় এই সব কাণ্ড চলছে তাহলে হিন্দুদের পাড়াতেও তাহলে এইরকম দৃশ্যই চলছে। গুন্ডা যখনই হিন্দু পাড়ায় পৌঁছবে তখন সেখানকার মুসলমানদেরও জানি কি হবে? কে বাঁচাবে তাদের? আজমল ভাবলো ফিয়ার্স লেনে যেমন ভালো মানুষ আছে তেমনি হিন্দু পাড়াতেও ভালো মানুষ আছে। এইসব হিংসা আর অবিশ্বাসজনিত পাপের ফল ভোগই সবাইকে ভুগছে। এইসব হিংসা একদিন সবাই ভুলে যাবে। কোলাকুলি হবে, হিন্দু-মুসলমান 'ভাই ভাই' বলে হাত মেলাবে। খোদা একদিন এই হিংসা, ভয় মানুষের মন থেকে মুছে ফেলবেন।

আজমল পরেশ - এর প্রতি সহানুভূতি দেখালো। তাদের চাল, ডাল দিয়ে রাখতে বলল। আজমল পরেশকে বলল নিজের বাড়ি বলে থাকো। পরেশ এই কৃতজ্ঞতা দেখে তার চোখে জল এল। পরেশ বলল আগের জন্মে তুমি আমার ভাই ছিলে। সত্তর বছরের বুড়ীর ধনুকের মত পিঠটাকে আবার সোজা ধরে বলল -

“আর তোরা সবাই আমার ছেলে - আমার রক্তমাংস - তোদের কল্যাণ হোক।”^{১২}

তারপরেই হোসেন বাড়ি ফিরল। সে তার বাবা অর্থাৎ আজমলের কথায় দাঙ্গা থামাতে গিয়ে মার খেয়ে এসেছে। হোসেন সহ বসির চাচা, মিঞা জাফরুল্লা, খালেক মিঞা - সবাই মিলে তাজ মহম্মদ ও তার অনুগামীদের দাঙ্গা করতে বারণ করেছিল কিন্তু দাঙ্গাজারা নাগালের বাইরে চলে গিয়ে হিংসা আর ক্ষোভে ফেটে পড়েছে। তারা কারোর কোন কথা শুনছে না। ফিয়ার্স লেনে ধীরে ধীরে গ্যাসের বাতি জ্বলে উঠেছে। দু-একজন করে লুণ্ঠনকারীদের দেখা যাচ্ছে। বীভৎসতার ছায়া ঘনিয়ে আছে চারিদিকে। রোজা ভেঙেছে গুন্ডারা। ক্ষুদা ও তৃষ্ণা নিবারিত করে দেহে ও মনে নতুন শক্তির জোয়ার এসেছে। সঙ্গে সঙ্গে হিংসা ও লোভ আরও প্রবল আরও প্রখর হয়ে উঠেছে। ধারালো ছোরাতে আবারও শান পড়েছে। ফিয়ার্স লেনে রাত দশটার সময় কোলাহল আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এবার দল আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। ‘আল্লা-হো আকবার’ ধ্বনি ক্রমেই ভয়াবহভাবে নিকটে এগিয়ে আসছে। আরও দূরবর্তী জায়গা থেকে কোলাহল ও আর্তনাদ ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কলুটোলার দিক থেকে একটা দল হাতে মশাল নিয়ে এসেছে শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য। মশালের কম্পিত আলোকে তলোয়ার তেল-চকচকে লাঠিগুলো ঝকঝক করে উঠেছে। আবারও চিৎকার শোনা গেল -

“জনতা এগিয়ে গেল। ফিয়ার্স লেন ও তৎসংলগ্ন সমস্ত গলির হিন্দুদের তারা শাস্তি দেবে। উৎকট উল্লাসে, মদমত্তের মত পা ফেলে, ছোরা তলোয়ার আর লাঠি ঘুরিয়ে তারা এগিয়ে চলল। তাদের অগ্রভাগে তাজ মহম্মদ। তার তলোয়ারের মুখে একটি রক্তাক্ত মাংস-পিণ্ড। ভালভাবে তাকাতেই বোঝা গেল যে, তা একটি কর্তিত স্তন - হয়তো কোন কুমারীর যৌবন-গর্ভ কিংবা কোন শিশুর লোভের আধার। তার দিকে মাঝে মাঝে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে লোকেরা হা-হা শব্দে হেসে উঠেছে। রমণীর মান অন্তর্হিত হয়েছে, সাম্প্রদায়িক বিষ-বন্যায় আজ সমস্ত নীতিই ভেসে গেছে। শুধু আছে আদিম পঙ্কিল প্রবৃত্তি। খুন

কর, লুটে নাও। ভালোবাসা দিয়ে নয়, ধারালো অস্ত্রে শত্রুকে বশ কর। আর শত্রু কে? ভাই-আপন ভাই।”^{১০}

ফিয়ার্স লেনের দিকে বহু জনতা এগিয়ে এলো। ফিয়ার্স লেন ও তৎসংলগ্ন সমস্ত বলির হিন্দুদের তারা শান্তি দেবে। বহু মানুষ উৎকট উল্লাস-মদমত্তের মতো পা ফেলে, ছোরা তলোয়ার আর লাঠি ঘুরিয়ে চলল। তাদের চোখে মুখে শুধুই হিংসার ছবি। সাম্প্রদায়িক বিষ-বন্যায় আজ সমস্ত নীতিই ভেঙ্গে গেছে। শুধু পড়ে আছে আদিম পঙ্কিল প্রবৃত্তি। তাদের মনের মধ্যে ছিল সবকিছু খুন করে লুট করে নাও, ভালোবাসা দিয়ে নয়, ধারালো অস্ত্র দিয়ে শত্রুকে বশ কর। সেইসব শত্রু হচ্ছে আপন ভাই। সেইসব আপন ভাইকে শত্রুর ভেবে মারা হচ্ছে।

এই দাঙ্গার ফলে আজমল কোরাণ পড়ার একাগ্রতা আর নেই। বারবার ঠুনকো কাঁচের মতো ভেঙে যাচ্ছে তার মন। তার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে পরেশ ও তার পরিবার। সেই সঙ্গেই নিবারণ, গজানন এবং তাদের মা বউ ছেলে মেয়ে সবাই আশ্রয় নিয়েছে। সবাই ভয় পেয়ে বলির পশুর মত কাঁপছে। একটি সাত বছরের ছোট মেয়ে বেদনার্ত শব্দ করল।

“পরেশ বাতাসে হাত আন্দোলিত করে, চোখ রাঙিয়ে, দাঁত খিঁচিয়ে এগিয়ে এল, ফিসফিস করে শাসিয়ে বলল, ‘চুপ, চুপ, - নইলে মেরে লাশ ক’রে ফেলব।’”^{১১}

ওরা সবাই চুপ করে বসে আছে, জীবন্মতের মতো বিমোহে। আজ রূপ-রস, গন্ধ, আলোকোজ্জ্বল ও হাস্যোচ্ছল মহানগরী আজ অন্ধকারে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। ফিয়ার্স লেনে বসবাসকারী বুড়ো লিনটিং, যার একটি পুরনো লোহালঙ্কড় দোকানে রয়েছে। সে ঝালাই, শান দেওয়া মেরামত করা, ছুরি কাঁটা তৈরি করে। সেও আজ দাঙ্গার ফলে ভয় পেয়েছে। বুড়ো লিনটিং ভাঙ্গা এক টেবিলের উপরে শ্বেত পাথরের ছোট একটা বুদ্ধমূর্তি সামনে দাঁড়িয়ে আছে। সেই মূর্তির পিছনে চিনা হরফে লেখা - ‘অহিংসা পরমধর্ম’। সে ওই মূর্তির সামনে হাতজোড় করে মাথা নীচু করে বসে থাকে। বুড়ো লিনটিং ভাঙ্গা পুরোনো চীনা রেকর্ড বাজাবার নেশাটা আজও ভুলে গেছে। সে শুধু শুনতে পায় কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। একদিকে নারীর কঠ অন্যদিকে শিশু কঠ এবং আহতদের আর্তনাদ গুমড়ে গুমড়ে উঠছে। অতি দূর থেকে নতুন একটা কোলাহল ভেসে আসছে। মেডিকেল কলেজের ও কলেজ স্ট্রীটের দিক থেকে ‘জয়হিন্দ’ শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে অপরদিক থেকে শব্দ ভেসে আসছে ‘আল্লা-হো-আকবর’। সেন্ট্রাল এভিনিউতে গরীব রিক্সাওয়ালাদের জবাই করা হচ্ছে। রক্তাক্ত শয়্যার মধ্যে শেষ স্বপ্নের মতো তাদের বাড়ি ঘরের কথা মনে পড়ল। তাদের মনে পড়ল মতিহারি, ছাপরা ও মজঃফরপুরের গ্রামের কথা। এই বীভৎস দাঙ্গার ফলে রিক্সাপুড়ছে, মোটর ট্রাকও পুড়ছে।

“বিভীষিকাময়ী কালরাত্রি নেমে এসেছে মহানগরীর বুকে। আর তারই মধ্যে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত ফিয়ার্স লেন। মানুষ আর মানুষ নেই। রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জার নীচে স্নেহ, মমতা ও ভালবাসার যে সুকুমার বৃত্তিগুলো মানুষের মধ্যে থাকে তা যেন সব হিংসার আগুনে বাষ্প হয়ে উড়ে গেছে।”^{১২}

হোসেন ফিরে এসে তার বাবাকে বলল রাস্তায় পুলিশ নেই, মাঝে মাঝে একটা ভ্যানে কয়েকজন মাইক্রোফোনে ঘোষণা করে গেল রাত ন’টা থেকে ভোর চারটে পর্যন্ত ‘কারফিউ অর্ডার’ জারি করা হচ্ছে। রাস্তা দিয়ে গুলীদের পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে। চারিদিকে আর্তনাদ ও কোলাহল ভেসে আসছে। পুরুষের পৌরুষ, নারীর মর্যাদা, শিশুর অসহায়তা আজ যেন সব ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। অন্যদিকে গিরিবালা নামে এক মহিলার করুণ পরিণতি। সে বাথরুমের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সব শুনছে। তার স্বামী, পুত্র, কন্যাকে গুলারা মেরে ফেলেছে। গিরিবালার বুকের পাঁজরায় ছোরা ডুকিয়ে তাকে মেরে ফেলে। শেষে আমরাও দেখব গুলারা ছোরা বের করে গিরিবালাকে মেরে ফেলেছে। আজমল সবকিছু শুনতে পেল। এইসব আর্তনাদ, এইসব কান্নার শব্দ, আজমল মনে মনে ভাবতে লাগলো সবাই আজকে পশু হয়ে গেছে। তাজ মহম্মদ-এর মত দুর্বৃত্তরা উত্তেজিত হয়ে আজমলের বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। কারণ তারা কোথা থেকে খবর পেয়েছে আজমল, তার বাড়িতে হিন্দুদের আশ্রয় দিয়েছে। মশালের আলোতে ফিয়ার্স লেন আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল। তাজমহম্মদ, আজমল-এর দরজায় ধাক্কা দিতে লাগলো। তাজ মহম্মদ আরও উত্তেজিত হয়ে দরজায় লাঠি মারতে লাগলো। সে বলল -

“হজ, করকে ভি বুট বাৎ বোলতা হায় অওর কাফের লোগোঁকো জাগহ্ দেতা হায় - তোড়ো, তোড়ো দরওয়াজা।”^{১৩}

সাকিনা নীচে নামতে বাধা দিল আজমলকে। আজমল কোন কথা না শোনে নীচে নামলো। পেছনে পেছনে সাকিনাও নীচে নামল। সিঁড়ি থেকে নেমে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো আজমল। তাজ মহম্মদ জিজ্ঞাসা করল কোথায় হিন্দু লোক। তাদের বের করে দাও, তখন আজমল বলল -

“কেন তোমরা এমন হয়ে গেলে ভাই? পবিত্র কোরানে আল্লাহর আদেশ প’ড়ে দেখো-কোন নির্দোষের অপকার করতে নেই, কোনো নিরীহের প্রাণ নিতে নেই। তার মালিক খোদা।”^{১৭}

তাজ মহম্মদ জোর গলায় আজমলকে ধাক্কার জানালো এবং সেই সঙ্গে আজমলের সারা শরীর কেঁপে উঠতে লাগলো। আজমল তাদেরকে বোঝাতে লাগলো দুনিয়ার আমরা সব একই মালিকের সন্তান। আমরা সব ভাই-ভাই। স্বার্থ নিয়ে লড়াই করার অনেক রাস্তা আছে। এ রাস্তা মঙ্গলের নয়, এ রাস্তা শুধু হিংসার। তাজ মহম্মদের মতো গুন্ডারা কোন কথা না শুনে তারা হিংস্র হয়ে উঠল। আজমলের জামা ছিঁড়ে ফেলল। তবুও আজমল তাদের বোঝাতে লাগলো সবাইকে ভালোবাস, আল্লাহর আদেশকে পালন করো, গুন্ডারা আরও ধাক্কা দিতে লাগলো আজমলকে। তাজ মহম্মদ বাঘের মত দাঁতে দাঁত ঘষে আরও ভয়াবহ হয়ে উঠল। তলোয়ারটা উত্তোলিত করল। তাজমলের পাঞ্জরে তলোয়ারটা তলোয়ারটা আটকে গেল। আজমল ‘খোদা’ বলতে বলতে টলতে লাগলো। তার পিককারীর মত রক্তের ধারায় তাজ মহম্মদের বুটিকার পাঞ্জাবিটা লাল হয়ে উঠলো এবং শেষে আজমল সশব্দে পড়ে গেল। তলোয়ারটা সজোরে টেনে বের করে তাজ মহম্মদ হুকুম করল অনুগামীদের যে, বাড়ির ভিতরে গিয়ে সব হিন্দুদের বের করে আনতে। যারা বাড়ির ভিতরে লুকিয়ে ছিল। আজমলের লাল রক্তের ধারা দেখে অনেক মাথা নিচু করল। তারপর জনতা ভাঙতে লাগলো। ওরা মুসলমানকে বধ করে কোন আনন্দ পেল না। একজন বলল -

“আখের মুসলমানকো মারা হামলোগ - আপনা ভাইকে মারা!”^{১৮}

আজমলের এই অবস্থা দেখে সাকিনার মূর্ছা হয়ে পড়ে গেল। জাহানারা, ফাতিমা ও রোশনারা সবাই কান্না করতে করতে বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে এল ফিয়ার্স লেনে।

উপন্যাসের শেষে আমরা দেখতে পাবো চারিদিকে ভেসে আসছে আর্তনাদ ও বিলাপ ভেসে আসছে। অসংযত জনতার তাণ্ডব লীলার শব্দ শোনা যাচ্ছে ‘আল্লা-হো-আকবর’ ধ্বনি। শোনা যাচ্ছে দরজা ভাঙার শব্দ। মহানগরীর বুকো নরক নেমে এসেছে। আর সেই নরকের মধ্যে বিচ্ছিন্ন ফিয়ার্স লেন। আজ ফিয়ার্স লেনে চীনা গণিকাদের কলহাস্য নেই, নেই সিনেমার গান। শুধু আছে রক্তাক্ত পথ, গ্যাস-লাইটের আলোর পাশে ভৌতিক অন্ধকার। হোসেন তার পিতার রক্তের দিকে তাকাল, সে নিজেকে বলতে লাগলো ভয় নেই এখনো বসির চাচা আছে, মিঞা জাফরুল্লা আর খালেক মিঞা আছে। তারা কখনো হার মানবে না। রক্ত ও আত্মবলি দিয়ে এই রক্তবন্যাকে থামাতে হবে। থামাতে পারলেই মনুষ্যত্বের জয় হবে।

এই উপন্যাসে নবেন্দুর প্রতিপাদ্য বিষয় খুব স্পষ্ট। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বর্ণনায় যে আনুপঞ্জ্য ছবি ফুটে উঠেছে তাতে হিন্দুর ওপর মুসলমানের আক্রমণ ও পক্ষান্তরে মুসলমানের ওপর হিন্দুর অত্যাচারের ছবি অঙ্কন করে থেমে যাননি লেখক। বুঝিয়েছেন এই অমানবিকতার উপরে জয়ী হবে মনুষ্যত্ব, জয় হয় মানবতার।

Reference:

১. উমর, বদরুদ্দিন, সাম্প্রদায়িকতা, নবপত্র প্রকাশণ, প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬, পঞ্চম মুদ্রণ, কলিকাতা ৭৩, পৃ. ১০
২. রহমান, মীজানুর, ‘কৃষ্ণ ষোলই’, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, প্রথম প্রকাশ ২০০০, পৃ. ২৯৪-২৯৫
৩. ঘোষ, নবেন্দু, ফিয়ার্স লেন, ডি. এম. লাইব্রেরি, তৃতীয় মুদ্রণ অক্টোবর ২০২৪, কলকাতা-০৬, পৃ. ১০
৪. তদেব, পৃ. ১৭
৫. তদেব, পৃ. ২১
৬. তদেব, পৃ. ৩২
৭. তদেব, পৃ. ৩৭
৮. তদেব, পৃ. ৭৩

৯. তদেব, পৃ. ৯৭
১০. তদেব, পৃ. ১০৩-১০৪
১১. তদেব, পৃ. ১০৯
১২. তদেব, পৃ. ১১১
১৩. তদেব, পৃ. ১১৫
১৪. তদেব, পৃ. ১১৬
১৫. তদেব, পৃ. ১২৯
১৬. তদেব, পৃ. ১৩৬
১৭. তদেব, পৃ. ১৩৭
১৮. তদেব, পৃ. ১৩৯